চিরকুট ৩৭

অবশেষে ক্যানাডাও সমকামীদের বিয়ের বৈধ অধিকারের আইন পাশ করলো। তারপর স্পেন এই দলে যোগ দেওয়ার মোট দেশের সংখ্যা দাঁড়ালো চারে। বেলজিয়াম আর নেদারল্যান্ড আগেই এই আইন পাশ করেছে। প্রকৃতপক্ষে এই আইনটা কি? কেন এটা পাশ করা এত জরুরী হলো? এতে কারা বেশী লাভবান হলো?

ক্যানাডার সমকামীদের বিয়ে বৈধ হওয়ার একটা বেশ দীর্ঘ ইতিহাস আছে। সর্বপ্রথম সমকামীদের অধিকারের বিষয়টা সামনে আসে ১৯৬৫ সালে। টরন্টোয় অস্ত্র আইনের মামলার আসামী Everett Klippert পুলিশকে বলে যে, সে বিগত ২৪ বৎসর যাবৎ এক পুরুষের সাথে যৌন জীবন যাপন করছে। এতে তার মামলার দিক পরিবর্তিত হয়ে যায় - তাকে উৎস্খল জীবন যাপনের দায়ে ২ বৎসরের কারাদন্ড দেওয়া হয়। কারাগারে সে দু'জন মনবিজ্ঞানীর সাথে কথা বলেন এবং মনোবিজ্ঞানীরা একমত হয়ে তাকে একজন ভয়াবহ যৌনবিকৃত হিসাবে চিহ্নিত করেন - ফলে কোর্ট তাকে আজীবন কারাবাসের আদেশ দেন। দুই বৎসর পর ক্যানাডার সুপ্রিমকোর্ট এই আদেশ বাতিল করেন এবং ১৯৬৯ সালে ক্যানাডার পার্লামেন্ট সমকামকে অনপরাধ (decriminalized) হিসাবে ঘোষনার সুবাদে ক্লিপার্ট ১৯৭১ সালের ২১ জুলাই জেল থেকে বেড়িয়ে আসে। তারপর আর সমকামীদের পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধাসমুহ যেমন পেনশান, ট্যাক্স আর অন্যান্য সুবিধাসমুহ পেতে লাগল। তখন এটা করা হতো কমন -ল পার্টনারস আইনে। সেই আইনে বিয়ে না করেও একজন পুরুষ আর একজন নারী একসাথে বসবাস করতে পারবে। কমন ল' তে বসবাসকারী যুগল রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বিবাহিত দম্পতির সমান হবে। কমন ল'তে থাকার সুবিধা হলো বিবাহের মতো একটা ব্যয়বহুল অনুষ্টান না করেই একসাথে বসবাস আর ভাল না লাগলে যে কোন সময় সেপারেশন - তালাক বা ডিভোর্সের ঝামেলা নেই। প্রকৃতপক্ষে সমাজের মুল ভিত্তি পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানকে অস্বীকার করা হয় কমন ল' আইনে। পরবর্তীতে সমকামীরাও সে সুযোগ চায় এবং প্রথমে কুইবেক, পরে ব্রিটিশ কলাম্বিয়া এবং সবশেষে অন্টারিওর সর্বোচ্চ আদালত যখন সমকামীদের বিবাহকে বৈধ বলে রায় দেয় - কারন ক্যানাডার সংবিধান অনুসারে লিঙ্গভেদে কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। সুতরাং যখন একজন নারী এবং নারীর মধ্যে বিবাহ নামক অনুষ্টানটাকে সীমাবন্ধ করার অর্থ গে বা লেসবিয়ান নামক ভিন্ন লৈঙ্গিক বৈশিষ্ঠের মানুষকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা মানবতা বিরোধী। তখন ফেডারেল সরকারের আইন পাশ করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। সেই ধারাবাহিকতা ধরে গত ২৮শে জুন ২০০৫ সালে পার্লামেন্ট ১৫৮ ভোটে বিলটি পাশ করে - যার বিপক্ষে ১৩৩ ভোট পড়ে। সি- ৪৮ নামের বিলটি আসলে বিবাহের চিরাচরিত সংজ্ঞা (Union between a man and a woman) পরিবর্তন করে নতুন সংজ্ঞা নির্ধারন করে (Union between two persons) ।

প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্র যখন ধর্ম থেকে আলাদা তখন ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গী আলোকে গৃহিত সংজ্ঞাকে লালন করা রাষ্ট্রের কাজ নয়। এখন ধরেই নেওয়া হচ্ছে পুরুষ, নারী ছাড়াও গে এবং লেসবিয়ান নামক আরো দুইটা লৈঙ্গিক প্রকার ভেদের (Sextual Orientation) মানুষ পৃথিবীতে বাস করে। রাষ্ট্র ইকুয়ালিটির নামে এই দলকেও সমমর্যাদা দিতে বাধ্য বলে কোর্ট সমুহ রায় দিয়েছে। সুতরাং আর কি বলার থাকতে পারে। অন্যদিকে আধুনিকতার নামে আমরা আগেই ধর্মকে একটা ভিলেন হিসাবে রাষ্ট্রীয় নীতির থেকে লক্ষ মাইল দুরে ফেলে রেখেছে। সুতরাং সমকামীতা একটা অনৈতিক কাজ তা কেন রাষ্ট্র শুনবে?

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যারা ধর্ম বিশ্বাস করে তাদের পক্ষে এই ধরনের যুক্তি মানা কঠিন। সমকামীতাকে একটা বিকৃতি আর পাপ হিসাবে সব ধর্মে বলা হয়েছে। কোরান শরীফে বিবরন দেওয়া হয়েছে লুত জাতিকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে সমকামীতার অপরাধে। অর্থাৎ সমকামীতা একটা জাতির ধ্বংশ ডেকে আনতে পারে। এই অবস্থায় ধর্ম বিশ্বাসীদের করনীয় কি? একটা বিষয় পরিস্কার যে, আইন করে যেমন ধর্ম প্রতিস্টা হয় না তেমনি আইন করে ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিবর্তন করা যায় না। এই প্রসংগে একটা কথা বলা দরকার। গত সপ্তাহে টরন্টোতে গে-লেসবিয়ানদের ২৫তম বার্ষিক প্যারেড (Pride Parade) হয়ে গেল। এতে টরন্টো সিটি কতৃপক্ষ অত্যন্ত আনন্দিত - কারন এতে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা হয়েছে টরন্টোতে। আর টিভিতে যা দৃশ্য দেখলাম -তাতে মনে হয় মানুষের এখনও আদিম সমাজের স্মৃতি মগজে জমা আছে। হাজার দুই মানুষ প্রায় উলঙ্গা হয়ে রাস্তায় বিভিন্ন ভঙ্গীতে নাচছে আর লক্ষাধিক মানুষ পাশে দাড়িয়ে উপভোগ করছে। একটা দৃশ্যে কথা বলা যাক - একটা বাহনে একজন নারী প্রায় নগ্ন হয়ে বসে আছে আর তার হাতে চাবুক। বাহনটা টানছে একটা পুরুষ। তার মুখে মুখোশ আর শরীর নগ্ন। টিভি ক্যামেরা যখন

তাকে তাক করছে তখন সে কুকুরের মতো ভঙ্গীতে ঢেকে উঠছে আর রাস্তায় দাড়ানো মানুষ উৎসাহের সাথে হাততালি দিচ্ছে। জানি না এতে কি আর্ট হলো আর কি ধরনের আনন্দ তারা পেল। সমকামীদের বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে – পশ্চিমা বিশ্বের ভোগবাদীতার এক নতুন উপসর্গ হচ্ছে গে আন্দোলন – শুধু নিজের ব্যাক্তিগত ভোগের জন্যে গে হওয়ার চেয়ে আর কি ভাল রাস্তা আছে – পৃথিবীতে নতুন মানুষ না এনে শুধু ভোগ করে যাওয়ার মধ্যে তারা আনন্দ খুঁজবে। তবে একটা পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় – নেদারল্যান্ডে আইন পাশ হওয়ার পর যে সংখ্যায় সমকামী বিবাহ হয়েছে তার সংখ্যা তিন বৎসরে কমে একচতুর্থাংশে দাড়িয়েছে। সুতরাং যারা বিবাহের চিরাচরিত সংজ্ঞায় বিশ্বাস করেন তাদের হতাশ হওয়ার কোন কারন নেই। এটা পুঁজিবাদী সমাজের একটা নতুন ফ্যাশন। যারা এটা পছন্দ করেন না তাদের জন্যে শুধু মনে রাখা – তোমার ধর্ম তোমার আর আমার ধর্ম আমার। কারন মানুষকে জবাবদিহী করতে হবে তার নিজের কর্মের জন্যে – অন্যে কর্মে জন্যে নয়।

(২)

এটা খুবই স্বাভাবিক যে, প্রবাসে যে কোন অনুষ্ঠানে – সেইটা হোক সামাজিক বা সাংস্কৃতিক – সেখানে পুরুষদের আড্ডায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ আসবেই। প্রথমে বাংলাদেশের সর্বশেষ খবর – তারপর আওয়ামী লীগ – বিএনপি – জামাত হয়ে শেষে একরাশ প্রস্তাবনা – মনে হবে এই প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নে বিলম্বই সকল সমস্যার কারন – এই ধরনের আলোচনা করতে করতে সাধারনত খাবারের ডাক পড়ে যায়। ফলে আলোচনার মাধ্যমেই বাংলাদেশ প্রসংগ শেষ। ইদানিং আমি ব্যক্তিগত ভাবে বাংলাদেশ প্রসংগ নিয়ে বেশী কথা বলি না বা বলতে পারি না। গত সপ্তাহে টরন্টোর এক খ্যাতিমান সাহিত্যিকের মেয়ের বিয়েতে গিয়ে বিষয়টা নিয়ে আরো বেশী বিব্রত হয়েছি। সেখানে উপস্থিত গন্যমান্য ব্যক্তিগন যখন বাংলাদেশ প্রসংগ নিয়ে আলোচনা করা শুরু করলেন – আমি সেখান থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই ধরা পড়ে গেলাম। কারন – সাম্প্রতিক বাংলাদেশ ভ্রমনের আগে সাধারনত এই সব আলোচনায় আমি ছিলাম বেশ উৎসাহী – শুধু উৎসাহী বললে ভুল হবে – প্রধান বক্তাও ছিলঅম সময় সময়। এখন আর আলোচনায় উৎসাহ পাইনা। তবে কি আমি বাংলাদেশের বিষয়ে হতাশ?

আসলে বিশেষ কিছু বিষয়ের বিবেচনায় আমার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ নিয়ে কথার মতো মেধা আমার নেই। সেখানকার সামাজিক – রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক নিয়মনীতি বুঝার জন্যে ইন্টারনেটে দু'চারটা পত্রিকা পড়াই যথেষ্ট নয়। সামগ্রিক বিষয়টা বুঝার জন্যে দরকার গভীর দর্শন এবং নিবিড় পর্যবেক্ষন। এ প্রসংগে কিছু কথা বলি – যা আমি ঠিক বুঝতে সমর্থ হইনি। যেমন – একজন মানুষ ধর্ম-চর্চা করেন এবং সাথে সাথে ঘুষ গ্রহন করেন – দুর্নীতি করেন। এরা এই ধরনের পরস্পরবিরোধী বিষয়গুলোকে কিভাবে এক সাথে ধারন করেন? তারপর দেখা যায় মানুষ প্রয়োজনে – অপ্রয়োজনে মিথ্যা বলে আর সেজন্যে একটুও অনুতপ্ত হয়না। তারপর ধরুন – দেশে গেলাম এবং ভাবলাম দেখবো মৌলবাদের উত্থান – দেখে এলাম বোম্বের আগ্রাসন। সামান্য একজন ইন্ডিয়ান আইডল (যারা শো-বিজনেসের স্বার্থে এক নতুন সৃষ্টি) দেখার জন্যে পঞ্চাশ হাজার তরুন-তরুনীর সমাবেশ হয় আর অন্যদিকে নকলের দায়ে হাজার ছাত্রের সাথে শত শিক্ষকও বহিস্কৃত হন। তারপরও হয়তো ভাবতাম এই সব সমস্যা নয় – যদি কেহ এর প্রতিকার বা নিরাময়ের কথা ভাবতো। যদি দেখতাম নতুন প্রজন্ম এর বিরুদ্ধে কথা বলতো – কিন্তু হতাশাটা সেখান থেকেই শুরু হয় – যখন দেখলাম নব প্রজন্ম অনিয়মকেই নিয়ম ভেবে তাদের কর্মপন্থা নির্ধারন করছে। এখন সরকারী কর্মকর্তা অর্থই ঘুষ গ্রহিতা – রাজনিতিক মানেই ঠিকাদার বা চাঁদাবাজ বা মাস্তানদের গডফাদার আর ছাত্র নেতা মানেই হয় ঠিকাদার বা সন্ত্রাসী বা চাঁদবাজ । তারপর চলছে বিপুল বিক্রমে বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড। র‍্যাব নামে এক খুনি বাহিনী তৈরী করে মানুষকে খুন করে তাকে আবার বৈধতা দেবার চেষ্টা হচ্ছে আর পাশাপাশি পুলিশ তাদের আয় বাড়ানো পুরো সুবিধা আদায় করছে পাল্লা দিয়ে খুন করার মাধ্যমে। আজ পর্যন্ত র‍্যাব খুন করেছে ১৫০ জন আর পুলিশ খুন করেছে ৩১৫ জন (সূত্র দৈনিক প্রথম আলো জুলাই ১৬, ২০০৫)। মানুষের মৌলিক চাহিদা শিক্ষা আর চিকিৎসা নিয়ে চলছে পুঁজির ভয়াবহ খেলা। শুধু মাত্র বনানীর কামাল আতাতুর্ক রোডে আছে ৬/৭ টা বিশ্ববিদ্যালয় (?)। ধানমন্ডিতে আছে ৫৬ টা শিক্ষা বিক্রয় কেন্দ্র – যেখানে অর্থই সনদ প্রাপ্তির একমাত্র মাপকাঠি। এক ভয়াবহ অসুস্থ পথে এগুচ্ছে বাংলাদেশ। আর এই ঘোলাপানিতে মাছ শিকারে নেমেছে ভারতীয় পুঁজি আর দেশী দালালরা। হতাশ হয়ে চুপ করে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাওয়া ছাড়া আর কিইবা করার আছে?

(৩)

যখন প্রায় লেখাটা শেষ করে ফেলেছি – তখন মিডিয়া কাঁপানো ভয়াবহ আরেকটা ঘটনা ঘটলো লন্ডনে। চারটা বোমায় মারা গেছে ৫৫ জন আর আহত ৭০০। পাশাপাশি একই দিনে বাগদাদে বোমায় মারা গেছে ৫৬ জন। মিডিয়া কাঁপানো

বলছি এ কারনে যে – এমন ঘটনা যদি লন্ডনে যা ঘটে – যদি একই ঘটনা ঢাকায় ঘটে তবে মিডিয়া তেমন কিছু একটা আসে যায় না – বিশ্বব্যাপী তেমন একটা কাঁপুনি আসে না। এ বিষয়ে এরিক মারগুলিস টরন্টো সানে লিখছেন – " We show the frightful TV footage from the London bombing but no footage at all of distraction of an entire Afghan village just days before by the U.S. Air Force". যেমন ধরুন সাদ্দাম হোসেন বসে আছে এমন একটা তথ্যের ভিত্তিতে আমেরিকান বাহিনী যখন রেস্টুরেন্টে বাঙ্কার ব্লাস্টার ফেলে শতাধিক নিরীহ মানুষের কবর রচনা করে – সেটাকে কিন্তু তেমন একটা আলোড়ন মিডিয়াতে দেখা যায় না বা আফগানিস্থানে কয়েক ডজন নিরিহ মানুষের মৃত্যু খবরে ভিতরে পাতার কয়েক ইঞ্চি যায়গা দখল করে – তখন মনে হয় কিছু মানুষ হয়তো মরার জন্যে জন্মায় আর কেহ নিরাপদে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার জন্যে বসবাস করে। ইরাকে লক্ষাধিক মানুষ মারা যাওয়ার কারন খুঁজতে গেলে উত্তর আসে – We are on a war now, সুতরাং এরকম দু'চারজন মানুষ মরবেই। এটাকে বলা হয় কোলেটারাল ড্যামেজ। প্রশ্ন আসে যদি আমরা যুদ্ধের মধ্যেই থাকি তবে কোলেটারাল ড্যামেজ তো সবদিকেই হবে। একদিকে প্রতিদিন ইরাকে বিচ্ছিন্ন অংগ প্রতঙ্গের ছবি লিভিং রুমে টিভিতে দেখবো আর বসে বসে ভাববো আমি তো নিরাপদ – এ ধরনের একটা কৃত্রিম নিরাপত্তা বোধের প্রতি নিঃসন্দেহে এই বোমা হামলা একটা বিরাট আঘাত। পাঠক ভুল বুঝবেন না, যে আমি এ ধরনের হামলার প্রতি সামান্য সহানুভুতিশীল। কিন্তু যে কোন ঘটনা ঘটার পিছনে কারন বুঝার জন্যে সকল ডাইনামিকস্ বুঝা দরকার। ধরুন ইরাকের মানুষদের কথা – দীর্ঘ ৩০ বৎসর সাদ্দামের কঠিন শাসন আর ইরানে সাথে যুদ্ধে কয়েক লক্ষ মানুষ জীবন হারালো। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে একটা যুদ্ধে তাদের জীবন যাপনের সমস্ত সুযোগ সুবিধা হারালো বোমার আঘাতে এবং আমেরিকা আর বৃটেনের অবরোধে মারা যায় আরো পাঁচ লক্ষ মানুষ (জাতিসংঘের হিসাবে) তারপর অন্যায় ভাবে চাপানো ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর চলমান যুদ্ধে আরো লক্ষাধিক মানুষ মারা গেল। এই দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরে ইরাকীরা কি পেয়েছে – শুধু অনিশ্চয়তা আর হতাশা ছাড়া। সুতরাং সেখানে আত্মহনন করার মতো পাঁচশত মানুষ পাওয়া যাওয়া কি স্বাভাবিক নয়? প্যালেস্টাইনে অর্ধ শতাব্দী ধরে ইসরায়েলের কথাই আইন – এমনকি এখনও আন্তর্জাতিক আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চলছে দেওয়াল তৈরী। এমন অবস্থায় সেখান থেকে কিছু রাগী যুবকের সন্ধান পাওয়া কি খুবই কঠিন? ধরুন ১৯৭১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্থিত্ব ছিল না – ভারত ছিল পুঁজিবাদের পথে – সে অবস্থায় বাংলাদেশ নামক একটা দেশ আজ থাকতো না। তবে যা থাকতো সেটা হলো আওয়ামী লিগ নামে হেজবুল্লাহ ধরনের একটা দল, যারা গেরিলা যুদ্ধ করে একটা দীর্ঘ ইতিহাস রচনা করতো – আর থাকতো একদল যুবক যারা জীবন বাজী রেখে দীর্ঘ সংগ্রাম করতো পাকিস্থানে বিরুদ্ধে। আল – কায়দা নামক যে দৈত্যটা আজ পৃথিবীতে বাস্তব তারা কি কোন ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত? উত্তরটা পরিষ্কার ভাবে হবে – 'না'। মধ্যপ্রাচ্যে রাজা-বাদশা আর পশ্চিমা পেট্রো-ডলারের স্বার্থরক্ষার জন্যে সিআইএ'র তত্ত্বাবধানে তৈরী একটা গোষ্ঠীর এটা একটা রাজনৈতিক যুদ্ধ। মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘকালীন তেল ব্যবসায়ী আর আমীর বাদশাদের জাঁতাকলে নীচে পড়ে যাওয়া একদল স্বাধীনতা আর গনতন্ত্রকামী মানুষরা পরবতীতে যুক্ত হয়েছে এই কঠিন সংগ্রামের পথে। লন্ডন বোমা হামলার পর টনি ব্লেয়ার কিছুটা হলেও সত্যে কাছাকাছি গিয়েছেন। তিনি এই ধরনের সন্ত্রাসী কাজের কারন বিশ্লেষনের চেষ্টা করেছেন – তার মতে প্রধানত তিনটা কারন এর পিছনে কাজ করছে- যথা দারিদ্র্যতা, গনতন্ত্রহীনতা আর মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা। মজার বিষয় এই তিনটা কারনের পিছনে মার্কিন আর বৃটিশদের আবদানই বেশী। তাহলে এখনকি আমরা আশা করবো মুল সমস্যাটাকে বিতারনে দিকে ব্লেয়ার সাহেব এবার নজর দেবেন? মনে হয় না, কারন বোমা হামলার দশ মিনিটের মধ্যে তিনি একটা গোষ্টিকে দায়ী করে তাদের শাস্তি দেবার অঙ্গীকার করেছেন আর বাকীটিতো পুলিশ করবে। তিনি এখন বলছেন – এটা ধর্মের ভুল ব্যাখ্যার কারনে করা হয়েছে। সেটাতো অনেক ভাল যে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যার জন্যে মারা যায় ৫৫ জন আর আপনাদের গোয়েন্দা রিপোর্টের ভুলের জন্যে মারা যায় লক্ষাধিক মানুষ। অন্যের ভুল শোধরানের আগে কি নিজের ভুল শোধরানো উচিৎ নয়?

এ যাবৎ লন্ডনের বোমা হামলার বিষয়ে পুলিশ যে তথ্য দিয়েছে তা আরো ভয়াবহ। হামলাকারী চার জনেই জন্ম বৃটেনে আর সেখানেই তারা বড় হয়েছে। এখনও কি সময় এসেছে নিজের আয়নায় মুখ দেখার। ভোগ-বিলাসের চুড়ান্ত সমাজে থেকেও সেই যুবকরা কিভাবে আত্মহত্যার মতো কঠিন একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। টরন্টো স্টারে কলামিষ্ট হারুন সিদ্দিকী লিখছেন – *প্রচুর কথা বলা হয়েছে এদের বিষয়ে, এখন সময় এসেছে শুনার*। সন্ত্রাস হচ্ছে একটা চক্র আর এটার থেকে বেড়িয়ে আসার পথ হচ্ছে পরস্পরের বোঝাপড়া – আলোচনা আর পারস্পারিক শ্রদ্ধা। ওয়ার অন টেরর নামে একটা বিশেষ ধর্মের বিশ্বাসীদের প্রোফাইল করে বা ছুতানাতায় একটা দেশ আক্রমন করে সেটাকে নরক বানানোর মাধ্যমে সন্ত্রাস বা সহিংসতা বন্ধ করা যাবে না – সেটা আরো বাড়বে। সেটা ইতিহাস কি প্রমান করে না? পাকভারতে দমন করে ইংরেজরা পারেনি, শ্রীলংকাতে পারছেনা তামিলদের দমন করতে – এমনকি ইংরেজরা পারেনি আমেরিকার স্বাধীনতাকে দমন করতে।

একটা কথা পরিষ্কার ভাবে জানা দরকার যে, সব ধর্ম-বর্ণ-জাতীর সাধারন মানুষ একটু শান্তি চায়। কিন্তু কুটিল রাজনীতির কারনে সেটা হচ্ছে না। মুসলমানদের মধ্যে শান্তি চায়না এমন মানুষ কি খুব বেশী? লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো - যারা চরম পথ ধরে এগুচ্ছে তারা চায় বিশ্বের অশান্তি আর সেটা হচ্ছে তাদের দল বড় করার পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক আবহাওয়া। বুশ-ব্লেয়ার ইরাক আক্রমন করে চরমপন্থীদের সেই চমৎকার সুযোগটাই করে দিয়েছে। ইরাকে চরমপন্থীদের গ্রেজুয়েশন হয় বলে আমেরিকারন অনেক বিশেষজ্ঞ স্বীকার করেছেন। প্রলম্বিত হওয়ার কারনে স্বাভাবিক জীবন ব্যহত হওয়ায় বেকারত্ব আর দারিদ্রত্য ইরাকে চেপে ধরেছে - ফলে ইরাকী যুবকরা এখন দলদলে যুদ্ধে যাচ্ছে - এবং সেটা দুপক্ষেই। এখানেই হচ্ছে গভীর বোধের বিষয়। সহজ কিছু সমস্যার দিকে নজর না দিয়ে ঢালাও ভাবে মুসলমানদের দোষারোপ করে পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম চরমপন্থীদেই সহায়তা করছে।

যে যেভাবেই ভাবুক না কেন, দৃশ্যমান ভবিষ্যতে মুসলমাদের নিস্তারে কোন পথ দেখছি না। যুদ্ধের বিশ্বকরনের যুগে বিশ্বে মুসলমানদের চেয়ে ভাল শত্রু আপাতত পাওয়া যাবে না। সুতরাং যুদ্ধ শিল্প আর যুদ্ধ সংক্রান্ত বানিজ্যের স্বার্থে আপাতত মুসলমানদের ভিলেনের ভুমিকাই থাকতে হবে। একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে পুর্ব দিক থেকে। চীন যেভাবে এগুচ্ছে - বলা যায় না,বন্দুকের নল হয়তো চীনের দিকে ঘুরে যেতেও পারে। তখন আর মুসলমান নিয়ে কেহ ভাববে না - যেমনটা আজ আর ভাবছে না কমিউনিষ্টদের নিয়ে। সেই পর্যন্ত যত ভাল ভাবে ইসলামের ব্যাখ্যা করাই হোকনা কেন - সেই ব্যাখ্যা শুনার মতো সময় আর প্রয়োজনীয়তা বুশ-ব্লেয়ার চক্রের নেই আর মুসলমানদের মুক্তি নই।

সবাই ভাল থাকুন।

আ. স. ম জিয়াউদ্দিন
টরন্টো
জুলাই ০৮, ২০০৫